মোদিজির ‘ভাইয়োঁ ঔর বহেনোঁ’ কারা

একের পাতার পর

বিভাজন, বিদ্বেষকেই হাতিয়ার করছেন বিজেপি নেতারা। ধর্মকে, জাতপাতকে কেন্দ্র করে এক দল শোষিত মানুষের বিরুদ্ধে আর এক দল শোষিত মানুষকে তারা খেপিয়ে তুলছে, দাঙ্গা বাধাচ্ছে।

বিজেপি শাসনে মানুষের দারিদ্র আরও বেড়েছে, বেকারি বেড়েছে, আরও মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, আরও কলকারখানা বন্ধ হয়েছে। হ্যাঁ, অগ্রগতি কি হয়নি? অবশ্যই হয়েছে। তা দেশের নিরানব্বই ভাগ সাধারণ মানুষের নয়, এক ভাগ শিল্পপতি-পুঁজিপতির। সরকার না দিলেও তার স্পষ্ট হিসাব দেশের মানুষের হাতে রয়েছে— যাকে কোনও ভাবেই প্রধানমন্ত্রী কিংবা তাঁর দল আড়াল করতে পারছে না। পুঁজিপতিদেরই একটি সংস্থা ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম তাদের রিপোর্টে দেখিয়েছে, ভারতের মোট সম্পদের ৭৩ শতাংশই কুক্ষিগত করেছে মাত্র ১ শতাংশ পুঁজিপতি। বিজেপি নেতারা বলতে পারেন, এ তো স্বাধীনতার পর থেকে দেশ যে নিয়মে চলছে তার ফল। ঠিকই, পুঁজিপতি শ্রেণির এই অবাধ লুণ্ঠনকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে দেশের শাসন প্রক্রিয়ায়, দেশের আইনে, সংবিধানে। কিন্তু যে নরেন্দ্র মোদি সবার বিকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ছাপান্ন ইঞ্চির ছাতি চাপড়ে সবার জন্য সুদিন আনার কথা বলেছিলেন তাঁর রাজত্বে সেই লুণ্ঠন প্রক্রিয়া কি বন্ধ হয়েছে? বন্ধ হওয়া দূরের কথা, এ যাবৎ কালের মধ্যে পুঁজিপতিদের লুঠতরাজ সবচেয়ে তীব্র আকার নিয়েছে গত পাঁচ বছরের বিজেপি শাসনে। কেমন তা? উপরোক্ত রিপোর্ট বলছে, ২০১৭ সালে যেখানে দেশের ধনকুবেরদের সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৩ লক্ষ ১৮ হাজার কোটি টাকা, মাত্র এক বছরে, ২০১৮ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩১ লক্ষ ৩৪ হাজার কোটি টাকা। প্রতিদিন তাঁদের সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ ২২০০ কোটি টাকা। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ যখন মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ছাঁটাইয়ের আক্রমণে জর্জরিত, দুবেলা দু'মুঠো খাবার জোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছে, তখন পুঁজিপতিদের এই অস্বাভাবিক সম্পদবৃদ্ধি ২০০৮ সালে বিশ্বজুড়ে মন্দার পর কোনও বছরে বিশ্বে সর্বাধিক।

দেশের সম্পদের এই নির্বিচার লুঠতরাজের সুযোগ পুঁজিপতিদের তো করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর সরকারই। আর জনগণের জন্য কী করেছে তাঁর সরকার? দেশের সম্পদের মাত্র ৪.৮ শতাংশ রয়েছে ৬০ শতাংশ মানুষের হাতে। এই সীমাহীন বৈষম্য ঘোচানোর কোনও উদ্যোগই নেয়নি মোদি সরকার। আর্থিক বৈষম্য ঘোচানোর উদ্যোগের দিক থেকে মোদির ভারত বিশ্বে ১৫৭টি দেশের মধ্যে ১৪৭ নম্বরে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের খরচের দিক থেকে ভারত বিশ্বে ১৫১ নম্বরে। তা হলে প্রধানমন্ত্রী তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতায় যে আত্মবিশ্বাস ও অগ্রগতির কথা বলছেন তা কাদের? অবশ্যই দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের। কারণ একমাত্র তাঁদেরই অগ্রগতি ঘটেছে। স্বাভাবিক ভাবেই নরেন্দ্র মোদির শাসনে তাঁদের আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে। তিনি জনগণকে যতই ‘ভাইয়োঁ ঔর বহেনোঁ’ সম্বোধন করুন, তাঁর আসল ভাই তো আম্বানি টাটা আদানি নীরব মোদি মেহুল চোকসিরা। তাই তো গত লোকসভা নির্বাচনে এইসব শিল্পপতি-পুঁজিপতিরাই তাঁদের ‘বিকাশ পুরুষ’ নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর দলকে জেতাতে পুঁজি একেবারে ঢেলে দিয়েছিল এবং এবারও দিয়েছে। দেশের সমস্ত খবরের কাগজে প্রতিদিন পাতার পর পাতা, চ্যানেলগুলিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মোবাইলে মুহুর্মুহু এস এম এসের প্রচারের জন্য হাজার হাজার কোটি খরচের টাকা তো তারাই জুগিয়েছিল, গত পাঁচ বছরে তার বহুগুণ তাদের উশুল করে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে বিজেপি সরকার। তাই তো দেশের মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে থাকলেও, বিনা চিকিৎসায় ধুঁকলেও তাদের মুনাফা আকাশ ছুঁয়েছে। ফলে বিজেপি শাসনে কাদের অগ্রগতি ঘটেছে তা বুঝতে দেশের মানুষের বাকি নেই।

প্রধানমন্ত্রী জনগণকে যতই ‘ভাইয়োঁ ঔর বহেনোঁ’ সম্বোধন করুন, তাঁর আসল ভাই তো আম্বানি টাটা আদানি নীরব মোদি মেহুল চোকসিরা। তাই তো নির্বাচনে এইসব শিল্পপতি-পুঁজিপতিরাই তাঁদের ‘বিকাশ পুরুষ’ নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর দলকে জেতাতে পুঁজি একেবারে ঢেলে দিয়েছিল এবং এবারও দিয়েছে।

বিজেপি নেতারাও বুঝে গেছেন ওই আচ্ছে দিনের বুজরুকি এবার আর কাজ দেবে না। তাই মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে ঢাকতে তাঁরা এবার উগ্র জাতীয়তাবাদের জিগিরকে হাতিয়ার করেছেন। সাথে রয়েছে গোয়েবলসীয় কায়দায় মিথ্যাচার। অর্থাৎ মিথ্যা কথাকে জোরের সাথে বলতে থাকলে, বারে বারে বললে মানুষ প্রাথমিক ভাবে তা বিশ্বাস করে ফেলবে। সেই বিশ্বাসকে পুঁজি করে ভোটে জিততে পারলেই শাসন ক্ষমতা হাতের মুঠোয়। প্রধানমন্ত্রী এই সাক্ষাৎকারে নিজেই বলেছেন, “আমার যে কোনও বক্তৃতা খতিয়ে দেখুন, তার একটা বড় অংশ কিন্তু উন্নয়নের কথা বলে।” অর্থাৎ মানুষের বাস্তব জীবনে উন্নয়নের চিহ্নমাত্র না থাকলেও প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় উন্নয়নের ছড়াছড়ি। এমনি করেই মানুষের জীবনের এক মিথ্যা চিত্রকে তাঁরা জোরের সঙ্গে তুলে ধরছেন। আর তাকেই দেশময় ছড়িয়ে দিচ্ছে বিজেপির আসল পরিচালক যে পুঁজিপতি শ্রেণি, তাদের পরিচালিত সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেলগুলি।

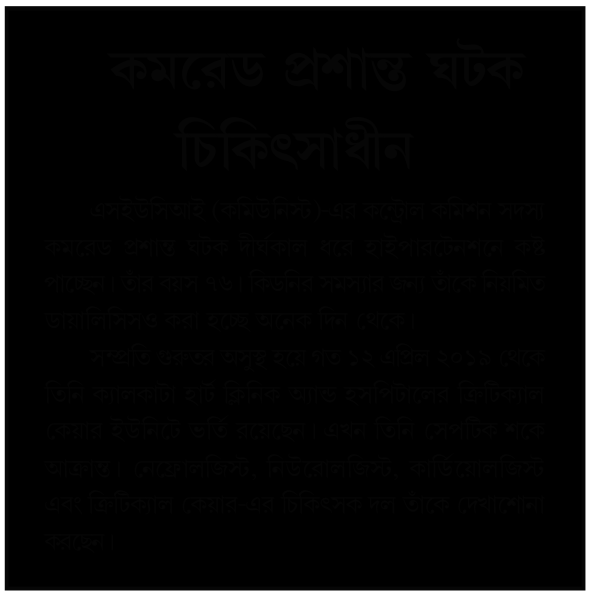

প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘যে সব অশুভ শক্তি ভারতকে দুর্বল করছে তাদের বিরুদ্ধেই আমার চ্যালেঞ্জ।’ কোন অশুভ শক্তি ভারতকে দুর্বল করছে? একশো তিরিশ কোটি ভারতবাসীর নিরানব্বই ভাগ সাধারণ মানুষ একবাক্যে বলবেন, দারিদ্র, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, দুর্নীতি, পুঁজিপতিদের বেপরোয়া লুঠপাটই ভারতকে তথা ভারতের মানুষকে দুর্বল করছে। প্রধানমন্ত্রী কি এই অশুভ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন? একেবারেই না। বরং অত্যন্ত সাবধানে, চালাকির মধ্য দিয়ে, কথার কারসাজিতে এই সব আসল অশুভ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াইটাকে তাঁরা এড়িয়ে যাচ্ছেন। পরিবর্তে দেশের মানুষের সামনে কিছু কাল্পনিক অশুভ শক্তি খাড়া করছেন।

জওয়ানদের মৃত্যু নিয়ে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতারা ভোটের রাজনীতি করছেন, এ দেশে তা নজিরবিহীন। দেশের মানুষ জওয়ানদের নিয়ে এই রাজনীতি একেবারেই পছন্দ করছে না। চাপে পড়ে ঢোঁক গিলে প্রধানমন্ত্রী বলছেন, “সন্ত্রাস এবং জওয়ানদের মৃত্যু কি মূল বিষয় নয়?” সন্ত্রাসকে সত্যিই প্রধানমন্ত্রী মূল বিষয় মনে করলে পাঁচ বছর পরে হঠাৎ ভোটের সময়ে এসে তাঁর সে কথা মনে পড়ল কেন? সন্ত্রাসরোধে যদি তিনি এতই আন্তরিক তো চল্লিশ জন জওয়ানের উপর হামলার গোয়েন্দা আশঙ্কা থাকলেও তাঁর সরকার তা আটকানোর ব্যবস্থা করেননি কেন? কারা এর জন্য দায়ী তাদের এখনও চিহ্নিত করা গেল না কেন। পুরো বিষয়টা নিয়ে দেশের মানুষকে ধোঁয়াশার মধ্যে রাখা হল কেন? এই সব কোনও প্রশ্নেরই উত্তর প্রধানমন্ত্রীর কাছে নেই। তাই এ নিয়ে যাঁরাই প্রশ্ন করছেন তাঁদেরই দেশদ্রোহী বলছেন তাঁরা। বালাকোটে জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংসের খবর গোটা বিশ্বের সংবাদ মাধ্যম অস্বীকার করলেও নির্বাচনী প্রচারে সেটাকে তাঁর সরকারের এক বিরাট সাফল্য হিসাবে তুলে ধরছেন প্রধানমন্ত্রী। এমনই হয়। জীবনের মূল সমস্যাগুলি সমাধানে যারা ব্যর্থ হয় তারাই এমন করে কাল্পনিক কোনও সমস্যাকে তুলে এনে তাকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। বিজেপি সেই কাজটাই করছে।

বাস্তবে বিজেপি, কংগ্রেস কিংবা আঞ্চলিক দলগুলি সবাই পুঁজিপতি শ্রেণির পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে কাজ করে চলেছে। তাই এদের একজনকে সরিয়ে অন্য জনকে ক্ষমতায় বসানোর দ্বারা সাধারণ মানুষের, শোষিত মানুষের জীবনের সমস্যাগুলির কোনও সুরাহা হবে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নির্বাচন হল, পুঁজিপতিদেরই পলিটিক্যাল ম্যানেজার এই দলগুলি কে ক্ষমতায় বসে পুঁজিপতিদের দেশের সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করে দেবে, জনগণের উপর আরও মূল্যবৃদ্ধি, করের বোঝা চাপিয়ে তাদের শোষণ করবে এবং বিনিময়ে নিজেরা এমএলএ এমপি মন্ত্রী হবে, এই লুঠপাটে ভাগ বসাবে তারই প্রতিযোগিতা। এই নির্বাচনের সাথে সাধারণ মানুষের স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই। শোষিত মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ হল জনসাধারণের দাবিগুলি নিয়ে সঠিক নেতৃত্বে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা, তার মধ্য দিয়ে জনগণের নিজস্ব সংঘশক্তি গড়ে তোলা এবং বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির দলের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা।

খরার কবলে কর্ণাটক

চারের পাতার পর

ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। রাজ্য মন্ত্রীসভার ৯ সদস্যের এক টিম ১৪টি জেলা পরিদর্শন করে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি এবং অবিলম্বে কেন্দ্রের ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড (এনডিআরএফ) থেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিষয় নিয়ে রিভিউ মিটিং করে। খরিফ ও রবি শস্য চাষের সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন— বন্যা, ভূমিধস, খরায় প্রায় ৩২ হাজার ৩৩৫ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাত্র ৯৪৯.৪৯ কোটি টাকা ধার্য হয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই সামান্য। এমনকী এনডিআরএফের নিয়ম অনুযায়ীও ৪৪৬০ কোটি টাকা পাওয়ার কথা।

কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করতে নতুন ও সন্দেহজনক পন্থা খুঁজে বের করে এবং কৃষকদের প্রতারিত করে। তারা খরা কবলিত এলাকাগুলির শ্রেণিবিন্যাস করতে নতুন নিয়ম তৈরি করে। কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতা হয় ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে— যখন ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচারাল এবং ফার্মারস ওয়েলফেয়ার নতুন মাপকাঠি ঠিক করে দেয়, যাতে অত্যন্ত খরাকবলিত এলাকাও কেন্দ্রীয় এই তালিকার অর্ন্তভুক্ত না হয়।

এতে স্বাভাবিকভাবেই অল্প খরাপ্রবণ এলাকা কেন্দ্রের রিলিফ ফান্ডের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না। স্পষ্টত, একমাত্র মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজ্য সরকার ‘ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড’-এর কাছে আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি জানালে কিছু পাওয়া যেতে পারে। এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এক দশক বা দু'দশকে একবারই ঘটে। অল্প খরাপ্রবণ হলে রাজ্যকে নিজস্ব ফান্ড থেকে খরচ করতে হবে।

ভারতের ৬৮ শতাংশ এলাকা খরায় ক্ষতিগ্রস্ত। এর মধ্যে ৩৩ শতাংশে মোট বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭৫০ মিলিমিটার কম হওয়ায় ‘দীর্ঘ খরা কবলিত’ বলে পরিচিত। এছাড়া ৩৫ শতাংশ এলাকায় গড় বৃষ্টিপাত ৭৫০-১,১২৫ মিলিমিটার হওয়ায় ‘খরা কবলিত’ হিসাবে চিহ্নিত হয়। উপদ্বীপ অঞ্চলের এবং পশ্চিম ভারতের শুষ্ক, আধা-শুষ্ক এবং আধা-স্যাঁতসেঁতে এলাকাই প্রাথমিকভাবে খরাপ্রবণ। এই রাজ্যগুলির খরার প্রকোপ এবং খরাপ্রবণ হিসাবে চিহ্নিতকরণের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। নতুন মাপকাঠি অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের চারটির মধ্যে অন্তত তিনটি প্রমাণ নির্দয়ভাবে লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে তবেই ভয়ঙ্কর খরার জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হবে।

এটা কোনও গোপন বিষয় নয় যে, প্রকৃতি ও আবহাওয়ার পরিবর্তন অনেকাংশে খরার প্রকোপ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। সরকারের থেকে কৃষক এবং কৃষি ক্ষেত্রে সহায়তার প্রয়োজন জরুরি। কেন্দ্র সরকার নির্লজ্জভাবে চালাকির সাথে নিজের দায়িত্ব রাজ্যগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে কৃষকদের ভয়ঙ্কর দুর্দশার মুখে ঠেলে দিচ্ছে। রাজ্য সরকারের করুণার তোয়াক্কা না করে অবশেষে কৃষকরা বারেবারে ঘটে চলা খরার প্রতিকারে রাস্তায় নেমেছেন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

প্রবীণ নেতা কমরেড রণজিৎ ধর চিকিৎসাধীন

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধরের বয়স এখন ৮৯ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, কিডনি এবং হৃদরোগের চিকিৎসা চলছিল। আগে মূত্রনালীর ক্যান্সার ও অপারেশনেরও ইতিহাস রয়েছে তাঁর। এছাড়াও নানা শারীরিক অসুবিধার জন্য বহু বছর ধরে নানা ওষুধ নিয়ে থাকেন তিনি। সম্প্রতি মূত্রের সাথে রক্তক্ষরণ, হাঁটাচলায় ভারসাম্যহীনতা, মস্তিষ্কে স্ট্রোক এবং ইনফেকশনের কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ডাঃ অশোক সামন্তের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞরা তাঁর চিকিৎসা করেছেন। রক্তক্ষরণ, ভারসাম্যহীনতা এবং ইনফেকশন নিয়ন্ত্রণে আসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলেও স্মৃতিক্ষয়, কথাবার্তায় সাযুজ্যহীনতা এবং হাঁটাচলায় ভারসাম্যের অভাব থেকে যায়। বয়সজনিত স্মৃতিদৌর্বল্য এবং আচার-আচরণের অস্বাভাবিকতার জন্য তাঁর চিকিৎসা চলতে থাকে।

ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালের চিকিৎসক দল ছাড়াও স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গৌতম গুহ এবং মনোবিদ ডাঃ পৃথ্বীশ ভৌমিক তাঁর চিকিৎসা করছেন। এছাড়াও ডাঃ গৌতম সরকার ও ডাঃ অনুপ মাইতি যাঁরা দীর্ঘকাল কমরেড রণজিৎ ধরের চিকিৎসা করেছেন, তাঁদের পরামর্শও নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বাড়িতেই প্রয়োজনীয় ওষুধ-পথ্য ও অন্যান্য সহায়তাগুলি দিয়ে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

নিয়ম বহির্ভূত কাজের বিরুদ্ধে আশাকর্মীদের ডেপুটেশন

আশা কর্মীদের 'দিশা' ডিউটির সময় নিয়ম বহির্ভূত কাজ করানো এবং দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ১৬ এপ্রিল উলুবেড়িয়া হাসপাতালে সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের হাওড়া জেলার পক্ষ থেকে। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমৎ আরা খাতুন ও জেলা সংগঠক নিখিল বেরা।

বিমান বসু'র হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে কিছু কথা

বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান ও সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা বিমান বসু গত ১৬ এপ্রিল চাকদহে এক নির্বাচনী জনসভায় তাঁদের প্রার্থীর সমর্থনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "বিজেপি-কে দিয়ে তৃণমূলকে হারানোর কথা ভুলেও ভাববেন না।" ত্রিপুরায় বিজেপি'র লুঠ-সন্ত্রাস থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন তিনি।

চাকদহের সমাবেশটি ছিল সিপিএম প্রার্থীর সমর্থনে। বোঝাই যায় সেখানে জমায়েতের অধিকাংশই ছিল দলের সংগঠিত অংশ। সিপিএমের নেতা-কর্মী-সমর্থকরাই সেখানে প্রধানত ছিলেন। এই রকম একটি সভায় বিমানবাবুর এই উক্তি বুঝিয়ে দেয় যে, তিনি সিপিএমের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যেই কথাগুলি বলেছেন।

তাঁর এই আকস্মিক হুঁশিয়ারি প্রমাণ করল যে, সিপিএমের কর্মী-সমর্থকদের একটা বড় অংশের মধ্যে বাস্তবেই একথা ঘুরছে, 'এবার ভোটে বিজেপিকে ভোট দাও, না হলে তৃণমূলকে হঠানো যাবে না।' কোথাও গোপনে চাপা গলায়, কোথাও প্রকাশ্যেই সিপিএম কর্মীদের মুখে বিজেপির প্রতি সমর্থন শুনে বামমনস্ক বহু মানুষই হতবাক। তৃণমূলের দ্বারা সরকারি ক্ষমতা হারিয়ে সিপিএম কর্মীদের রাজনৈতিক আদর্শগত অবস্থানটা এই দাঁড়াল শেষমেশ! প্রকাশ্য সভায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বিমান বসু বুঝিয়ে দিলেন, তাঁরা এ-খবর জানেন। জানারই কথা। একটি 'মার্কসবাদী' বলে দাবি করা ও শক্তিমান পার্টির কর্মীরা সরকারি ক্ষমতা হারিয়েই বিজেপির প্রতি সদয় হয়ে পড়ছেন। দলে দলে বিজেপিতে গিয়ে যোগ দিচ্ছেন। আর, এখন ভোটের মুহূর্তে নেতারা সাবধানবাণী দিচ্ছেন। কিছু দিন আগে এই প্রসঙ্গে দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাদের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র বলেছিলেন, 'বিষ চেখে দেখবেন না।' তারপরও কিন্তু বিজেপির দিকে সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের একাংশের ঢল কমেনি।

তবে এতকাল ধরে 'বামপন্থা' ও 'মার্কসবাদ'-এর কী চর্চা হল তাঁদের? নেতারা কী শিক্ষা দিলেন কর্মীদের সঠিক রাজনৈতিক চেতনায় সঞ্জীবিত করতে? ভবিষ্যৎ কিন্তু জবাব চাইবেই।

আমরা মনে করি, বামপন্থার নামে সিপিএম নেতাদের ভোটসর্বস্ব সুবিধাবাদী রাজনীতির চর্চাই এই পরিণাম ডেকে এনেছে।

চিটফান্ড ঃ আন্দোলন ছাড়া সমস্যার সমাধান নেই ঃ মত বুদ্ধিজীবীদের

চিটফান্ড সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজতে সিঙ্গুরের রতনপুর কোলে পাড়ার মোড়ে ৭ এপ্রিল সারাদিন ধরে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়—চিটফান্ড সমস্যা সমাধানের পথ। ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও পথিকৃৎ সংগঠনের অন্যতম সদস্য সুদীপ্ত দাশগুপ্ত, চিটফান্ড ব্যবসার উৎপত্তি, বিস্তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে দেখান যে ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারী ও এজেন্টদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া এই সমস্যা থেকে মুক্তির কোনও পথ নেই।

সঙ্গীত শিল্পী অসীম গিরি বলেন, সিঙ্গুরের জমি রক্ষার আন্দোলনে আমি ছিলাম, এই সরকার তখন ক্ষমতায় আসেনি। জিততে হলে আপানাদের একটা কাজ করতে হবে, আপনাদের ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী সকলকে নিয়ে আন্দোলনে রাস্তায় নামতে হবে। আপনারা জিতবেন। শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তীও আন্দোলনের পথেই এই সমস্যা সমাধানের দিশা দেখিয়েছেন। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন, অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারারস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রূপম চৌধুরী, জেলা সভাপতি মহাদেব কোলে, সম্পাদিকা অমিতা বাগ, প্রফুল্ল মান্না প্রমুখ।

ধর্ষণকারীর শাস্তির দাবিতে বাঙ্গালোরে বিক্ষোভ

কর্ণাটকের এক রায়চুরে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রীর ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই এম এস এস-এর পক্ষ থেকে ২০ এপ্রিল ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

নির্বাচনী প্রচারের মধ্যেই ওই দিন বাঙ্গালোর শহরে এই সংগঠনগুলি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। বক্তব্য রাখেন এ আই এম এস এস-এর রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড শোভা। তিনি অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।

রায়চুরে বিক্ষোভ

বাঙ্গালোরের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড শোভা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com